

বিপথগামী শিক্ষার্থী ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

আজ - কাল - পরশু

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

গত ১ জুলাই গুলশান ট্রাজেডি ও ঈদুল ফিতরের দিন শোলাকিয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। এসব সন্ত্রাসী ঘটনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষকের কারণে দেশের ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অভিযুক্ত হতে পারে না। যারা অভিযুক্ত হয়েছে, যথাযথ তদন্ত ও বিচারের মাধ্যমে দোষ প্রমাণিত হলে শাস্তি অবশ্যই তাদের প্রাপ্য।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি ক্যাটাগরি রয়েছে—ক. মানসম্পন্ন, খ. মাঝারি মানের, গ. নিম্নমানের। তিন ক্যাটাগরির বিশ্ববিদ্যালয়কে একই মানদণ্ডে বিচার করা ঠিক নয়। সত্যের খাতিরে বলা দরকার, বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মাঝারি ও নিম্নমানের। মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মান, শিক্ষকের মান, শিক্ষার পরিবেশ, কারিকুলাম ইত্যাদি নিয়ে বহু অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু ওসব বিষয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। এই নিবন্ধে আমরা শুধু গুলশান ট্রাজেডির পটভূমিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যে কয়েকটি অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে আলোচনা করব।

কেউ কেউ বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আদর্শিক ছাত্ররাজনীতি নেই বলে জঙ্গিবাদী রাজনীতি অনুপ্রবেশ করেছে। এই ধারণা ঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, আমাদের প্রধান দুটি ছাত্রসংগঠন মোটেও আদর্শিক রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত হয় না। মূল রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করা, দলের ভেতরে ও বাইরে বিশৃঙ্খলা করা, টেডারবাজি, হল দখল, ভর্তি-বাণিজ্য, নেতাদের তাঁবোদারি করা ছাড়া তাদের আর কোনো কর্মসূচি চোখে পড়ে না। এর বাইরে মাঝেমধ্যে অন্য কোনো ইতিবাচক কাজ করলেও তা এত সামান্য যে আলোচনায়ও স্থান পায় না। অথচ পাঠক জানেন, দেশের বেশ কয়েকটি অরাজনৈতিক যুব সংগঠন কত বড় বড় ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কাজেই ছাত্রসংগঠনের রাজনীতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন পেলে তাতে ছাত্রদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি।

কয়েকটি আদর্শভিত্তিক সুশৃঙ্খল ছাত্রসংগঠন রয়েছে। এদের সদস্যসংখ্যা বেশি না হলেও তাদের বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ নেই। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের তেমন প্রভাব নেই। যদি মনে করা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতি থাকলে জঙ্গিবাদী প্রভাব থাকবে না, তাহলে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির ছদ্মবেশে লেজুড় ছাত্রসংগঠনও ঢুকে পড়তে পারে। একবার অনুমতি দিলে তাদের হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। পুরো পরিবেশটাই কলুষিত করে ছাড়বে।

যদি অনুমতি দিতেই হয়, তার জন্য দরকার ছাত্ররাজনীতি ইস্যুতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের মতামত গ্রহণ। ভোটে যদি ছাত্ররাজনীতির পক্ষে বেশি মত পাওয়া যায়, তাহলে ছাত্ররাজনীতি চালু হবে। আর যদি 'না' ভোট বেশি পড়ে, তাহলে ছাত্ররাজনীতি ঢুকতে পারবে না। ছাত্র-শিক্ষকদের মতামতের ওপর তো কথা থাকতে পারে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি যদি সুস্থ ছাত্ররাজনীতির ব্যাপারে আন্তরিক হয়, তাহলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের মতামত যাচাই করার জন্য আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি। মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি যেন কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দেয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যদি ছাত্ররাজনীতিকে অনুমোদন না করে, তাহলে একটা শূন্যতা থেকে যেতে পারে। সেই শূন্যতার সুযোগ নিয়ে জঙ্গি গ্রুপগুলো কৌশলে ঢুকেও যেতে পারে। সে জন্য একধরনের লেজুড়মুক্ত ছাত্রসংগঠন, তাদের কর্মসূচি, কর্মসূচির সমর্থনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হলে একদিক থেকে ভালো হতো। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ছাত্রজীবনের শেষ ধাপ। জীবনের এই পর্যায়ে ছাত্ররা সংগঠিত হবেন, বক্তৃতা করবেন, ভোট দেবেন, কাজ করবেন, নানা প্রকাশনা করবেন—এগুলো খুব মূল্যবান অভিজ্ঞতা। ছাত্রদের এ রকম অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

দুঃখের বিষয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে ছাত্ররাজনীতি রয়েছে, সেখানে ২৫ বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না। অর্থাৎ

২৫ বছরে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী নির্বাচন, নির্বাচনী প্রতিযোগিতা, নির্বাচনী বিতর্ক, নির্বাচনী সংস্কৃতি, ভোট দেওয়ার আনন্দ, জয়ের আনন্দ, পরাজয়ের বেদনা ইত্যাদি কোনো কিছুই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেননি। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সরকার কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। গত ২৫ বছর সারা দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত নির্বাচন হলে আজ অন্তত ১০০ জন তরুণ ও পরীক্ষিত 'নেতাকে' আমরা দেশের রাজনীতি ও পার্লামেন্টে দেখতে পেতাম।

বর্তমান বাস্তবতায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরও এই সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রণীত নিয়মকানুন ও শর্ত অনুসরণ করে বছরে একবার বা দুই বছরে একবার 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন'-এর ব্যবস্থা থাকা উচিত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যে ভুল করেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তা করা উচিত হবে না।

অনেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কো-কারিকুলাম কর্মসূচির অভাবের কথা বলেছেন। আমাদের জানামতে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কো-কারিকুলাম কর্মসূচি রয়েছে। তবে হয়তো বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তা নেই। ছাত্রদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের জন্য কো-কারিকুলাম কর্মসূচি থাকা খুবই প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ইউজিসি একটি কাঠামো ও ক্যালেন্ডার সুপারিশ (নির্দেশ নয়) করতে পারে, যা বেসরকারি ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অনুসরণ করবে। আমরা মনে করি, এই কো-কারিকুলাম কাঠামোটি খুব জরুরি।

কো-কারিকুলাম কর্মসূচির সঙ্গে নম্বর ও উপস্থিতি যুক্ত করা যায় কি না, তা-ও ভেবে দেখতে হবে। কারণ, অনেক ছাত্রছাত্রী নিছক আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতে পছন্দ করেন। তা স্বাস্থ্যকর নয়। পরীক্ষার নম্বর বা গ্রেড যুক্ত না থাকলে অনেক ছাত্রছাত্রী ক্লাসরুমের বাইরে কিছু করতে আগ্রহী হন না। কেউ কেউ বলেছেন, 'প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে'

বাংলাদেশের ইতিহাস পড়া সব বিষয়ের সঙ্গে বাধ্যতামূলক করা উচিত। আমরা এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস একজন ছাত্রের স্কুল বা কলেজেই পড়ে আসা উচিত। না পড়লে তার জন্য দায়ী স্কুল ও কলেজের সিলেবাস ও কর্তৃপক্ষ। কলেজজীবনের পর সারা জীবন একজন মানুষ দেশের ইতিহাস পড়বেন, ইতিহাসের নানা ব্যাখ্যা পড়বেন, দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মজীবনী পড়বেন। পড়ার কি শেষ আছে? এসব পড়াকে কোনো সিলেবাসে আবদ্ধ করা উচিত হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্র একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে আসেন। তাকে সেই জ্ঞান অর্জনে নানাভাবে সহায়তা করা উচিত। এই জ্ঞান নিয়ে তিনিই কর্মজীবনে প্রবেশ করবেন। অন্য কোনো বিষয় দিয়ে তাঁর বিশেষ জ্ঞান অর্জনে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না।

স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে একজন ছাত্র যেন বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে আসতে পারেন, সে জন্য উপযুক্ত বই রচনা, কারিকুলাম, পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি ইত্যাদি ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে আরও মনোযোগী হতে হবে। স্কুল ও কলেজের লেখাপড়াকে (ও ইতিহাসপাঠ) অবহেলা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সব দায়িত্ব চাপালে তা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জায়গা।

একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা থাকেন। বাকি সময় তিনি থাকেন বাড়িতে, পাড়ায় ও বন্ধুদের আড্ডায়। ঠিক কোন পরিবেশে কে তাঁকে জঙ্গিবাদে প্রভাবিত করছে, তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। সম্প্রতি একজন অভিযুক্ত জঙ্গি তরুণের ক্ষেত্রে জানা গেছে, তাঁদের বাড়ির ভাড়াটের মাধ্যমে তিনি জঙ্গিবাদের দীক্ষা পেয়েছেন। এখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কোথায়?

আমাদের তরুণেরা যেন জঙ্গিবাদের দীক্ষা নিতে না পারেন, সে জন্য সব দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই দৃষ্টি রাখলে হবে না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হবে পরিবারকে। তবে সেটাও সহজ কাজ নয়। কারণ, বেশির ভাগ ছাত্র এখন মা-বাবার কোনো কথা শোনেন না। মা-বাবাকে ভয় করেন, এমন ছাত্রের সংখ্যাও কম। তাঁরা শুধু মা-বাবার টাকা চান, আর কোনো পরামর্শ বা নির্দেশ তাঁরা মানতে রাজি নন। এ রকম অব্যাহা ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেক মা-বাবা হতাশ ও অসহায়। আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি ও গবেষণার মাধ্যমে আমাদের পথ খুঁজতে হবে। এর কোনো তৈরি সমাধান নেই।

● মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর : মিডিয়া ও উন্নয়ন কর্মী।

আমাদের তরুণেরা যেন জঙ্গিবাদের দীক্ষা নিতে না পারেন, সে জন্য সব দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই দৃষ্টি রাখলে হবে না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হবে পরিবারকে